ভূমিকা

প্রতিটি মানুষের দৈনন্দিন যাপন, তার পরিবেশ, পরিবার, শিক্ষা যেমনভাবে একজন মানুষের হয়ে ওঠার ইতিহাসকে নির্দেশ করে, তারই পাশাপাশি আরেকটি বিষয় আমাদের মানসিকতা গঠনে ও তার পুষ্টিবর্ধনে অপরিহার্য— তা অবশ্যই শিশুসাহিত্য। সেই সাহিত্য তথাকথিত অক্ষরজ্ঞানহীন কথকদের মুখে মুখে প্রচারিত লোকগাথা, রূপকথা বা মহাকাব্যের কাহিনিই হোক, কিংবা প্রতিষ্ঠিত লেখকদের ছাপার অক্ষরের শিষ্ট সাহিত্য। আসলে শিশুরাই অদূর ভবিষ্যতের প্রতিটি দেশ তথা সমাজের অবশ্যম্ভাবী নিয়ন্ত্রক-ধারক-বাহক-পরিচায়ক; তাই তাদের সার্বিক গঠন এক সামাজিক দায়। শিশুসাহিত্যিকেরা অত্যন্ত সচেতনতার সাথে সেই ভার বহন করে চলেন। আমাদের দেশে একসময় মহাকাব্য, প্রচলিত ছড়া বা লোককথার মাধ্যমে শিশুদের জীবনের পাঠ দেওয়া হত, ক্রমশ তা বদলে জায়গা করে নিল নীতিকথা সর্বস্ব সাহিত্য। তাদের হিতার্থে সম্পাদিত হতে লাগল নানা পত্রিকা— 'সখা', 'সাথী', 'মুকুল', 'বালক' ইত্যাদি এবং এদের সাথে জড়িত ছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা শিশুসাহিত্যিকেরা, ঠাকুর পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু এই পত্রিকার সকলেই শিশুদের সাময়িক চাহিদা মেটালেও তাদের মনোরঞ্জন, চাহিদা এবং প্রয়োজনীয়তা এই তিন বিষয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে ব্যর্থ হচ্ছিল। এমন সময় 'সন্দেশ' পত্রিকার মাধ্যমে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী যুগান্তর আনলেন বাংলা শিশুসাহিত্যে; পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সচেতনভাবে শিশুদের জন্য নতুন ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করলেন আর সুকুমার রায় পূর্বসূরিদের প্রচেষ্টাকে নতুন খেয়াল রসে জারিত করলেন।

শিশুসাহিত্য মানে কেবলই শিশুদের শিক্ষণীয় নীরস বিষয়ের সমাহার— এই সীমাবদ্ধতাকে ভেঙে শিশুদের পছন্দ-অপছন্দকে গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি যে শিশুসাহিত্যিকের দায়িত্ব শিশুদের জন্য পরিবর্তমান সময় ও সমাজকে আত্তীকরণ করে এগিয়ে চলার রাস্তা প্রশস্ত করা, একই সাথে অজানাকে জানানোর প্রয়াস এবং অদেখার প্রতি কৌতুহল সৃষ্টি করা— এই বোধকেই মূলধন করে আজীবন শিশুসাহিত্য রচনা করে গেছেন লীলা মজুমদার। জীবনের এক একটি পর্যায়ে শিশু কিশোরদের চাহিদাও যে বদলে যেতে থাকে, সেই বিষয়ে সচেতন ছিলেন তিনি। তাই লেখার বিষয় হিসেবে তিনি যেমন প্রচলিত কাহিনি নিয়ে এসেছেন; তেমনই জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোরের মতোই কঠিন বিজ্ঞানের সহজ ব্যাখ্যাকেও তুলে ধরেছেন; আবার বড়দা সুকুমারের ফ্যান্টাসিকেও এড়িয়ে

যাননি তিনি; ছোটদের দুষ্টুমি, তাদের নিজস্ব ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন; তাদের অত্যন্ত প্রিয় ভূত, অ্যাডভেঞ্চার, গোয়েন্দা কাহিনিকে অস্বীকার করেননি; অন্যান্য শিশুসাহিত্যিকদের মতোই পশু-প্রকৃতি তাঁর গল্পের অন্যতম বিষয়, কিন্তু তাদের মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা নেই, তারা প্রত্যেকেই বাস্তবসম্মত ভাবে নিজেদের আচার-আচরণের নিজস্বতা নিয়ে গল্পে জায়গা করে নিয়েছে।

লীলা মজুমদার প্রকৃতপক্ষে চেয়েছিলেন ছোটদের জিজ্ঞাসু কৌতুহলী মনকে উৎসাহিত করতে; সাহিত্য, বিশেষত বাংলা ভাষার প্রতি ছোটদের ভালোবাসা জন্মাতে এবং তারই সাথে অবক্ষয়িত সমাজে কঠিন বাস্তবের মুখে দাঁড়িয়ে ছোটদের মধ্যে ভালো-মন্দের বোধ তৈরি করতে। তিনি তাঁর সাহিত্যে কোথাও নির্দেশ দেননা ছোটদের করণীয় কী, তাঁর গল্পের ছোট-বড় সকলেই আমাদের আশেপাশে দেখা ভুলে-ভ্রান্তিতে ভরা মানুষ, যারা প্রতিনিয়ত জীবনে ভুল করতে করতে শেখে কী করা উচিত আর কি করতে নেই। লীলার গল্পের মুখ্য চরিত্র গণশা, ঘোঁতন, গুপে, গুপী, পানু দুষ্টুমিতে ভরপুর; পড়াশোনা বা নিয়ম, যাকে আমরা প্রাতিষ্ঠানিক ভাষায় ভালো মানুষের গুণ হিসেবে নির্ধারণ করে থাকি, তা এদের কারোরই নেই, তবে এরা নিজেদের ভুলের থেকে শিক্ষা নিয়েছে, আবার ভুল করেছে যা আমরা সাধারণ মানুষেরা করে থাকি। আর এখানেই এই চরিত্ররা খুদে পাঠকদের দোসর হয়ে ওঠে। তাদের করা ভুল, তার পরিণাম থেকে অনায়াসেই পাঠকরা নিজেদের চলার পথ বেছে নিতে পারে। তবে লীলা সচেতন ভাবে ছোটদের মনে গেঁথে দিয়ে যান মানবিকতা, কৃতজ্ঞতা, পরোপকারীতা, সহিষ্ণুতার বোধ। ইংরেজ শাসন-শোষণ, দেশীয়দের প্রতিবাদ, স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ লড়াই, দেশভাগ, স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা, দুই বিশ্বযুদ্ধ— লীলা এই বিধ্বস্ত বাংলার প্রতিনিধি। তিনি প্রতিনিয়ত নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছেন ক্ষয়িষ্ণু সমাজে দাঁড়িয়ে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শৈশব; তাই তাদের কোন নিয়মানুবর্তিতার শাসনে বাঁধতে চাইলে লাভের থেকে ক্ষতিই হবে বেশি। তাই তাদের বন্ধু হয়ে তাদের জীবনযাপনের সমান্তরাল জীবনের ছবি এঁকে তাদের মধ্যে মূল্যবোধের জাগরণ ঘটাতে চেয়েছিলেন তিনি। এখানেই লীলা মজুমদারের অনন্যতা।

শুধু বিষয় নির্বাচন কিংবা চরিত্র গঠন নয়; লীলা মজুমদারের গল্পের ভাষা, শব্দচয়ন তাঁর গল্পকে ভিন্নতা দান করে। নিজের ছেলেবেলায় বাংলা ভাষা, ব্যকরণ শিক্ষা নিয়ে যে সমস্যার সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছিল, সেই সমস্যা থেকেই তিনি বুঝেছিলেন সাহিত্যের মাধ্যমে খুদে পাঠকদের বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসা জন্মাতে হবে। তাই অত্যন্ত সহজ,

সাবলীল ভাষাকে মাধ্যম করে তিনি তাঁর গল্প সাজিয়েছেন। ছোটদের ব্যবহার্য শব্দ, এমনকি আধুনিক সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রাখতে তিনি একালের নতুন নতুন শব্দ ছোটদের মুখে বসিয়েছেন; ছোট্ট ছোট্ট বাক্যের সমাহার তাঁর গল্পগুলি; ছোটদের স্বভাবসিদ্ধ প্রশ্নের ডালিকেও তিনি গল্পে নিয়ে এসেছেন। একইসাথে গল্পের উপস্থাপন ভঙ্গীতে এনেছেন কৌতুহল ও সরসতা যা পাঠককে অনায়াসে গল্পের সমাপ্তির দিকে টেনে নিয়ে যায়। আসলে লীলা মজুমদার সব অর্থেই চেয়েছিলেন শিশুদের চিন্তন, মনন, কোমল-স্থিতিস্থাপক মন, কৌতূহল, তাদের স্বভাবসুলভ দুষ্টমি সমস্ত কিছুকে রক্ষা করেই তাদের সাহিত্যের পাঠক করে তুলতে এবং এমন সাহিত্য তাই তিনি খুদে পাঠকদের জন্য নিয়ে এসেছেন যা আক্ষরিক অর্থেই তাদের মনোরঞ্জন, অবসর যাপনের সঙ্গী হয়ে ওঠে।

পারিবারিক পরিমণ্ডল, পরিবেশ, প্রতিবেশ, সর্বোপরি তাঁর মায়ের তাদের লালনের পদ্ধতি লীলা রায়ের ছেলেবেলাকে সুরক্ষিত রেখেছিল; কিন্তু যে বোধ তাঁর মধ্যে সেইসময় প্রোথিত হয়েছিল তা আজীবন তাঁর সম্পদ হয়েছিল। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল স্বল্পপরিসরের জন্য শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে শিক্ষকতার সুযোগ, বেতারের কর্মজীবন, অসংখ্য গুণী মানুষের সান্নিধ্য। সকল অবস্থা থেকেই লীলা সমস্ত কিছুর রং-রূপ-রস নিংড়ে নিয়েছিলেন এবং তাকেই সাজিয়ে দিয়েছেন ছোটদের সাহিত্যে। লীলা মজুমদারের এই প্রয়াসকে আমরা ছয়টি অধ্যায়ে ভাগ করে আমাদের অভিসন্দর্ভে তার বিশ্লেষণ করেছি— ‘পারিবারিক ঐতিহ্য ও লীলা মজুমদার’ শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে পরিবারের পূর্বসূরিদের থেকে লীলা মজুমদার সাহিত্যিক জীবনে যা গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই গ্রহণকে যেভাবে তিনি নিজস্বতা দিয়েছেন, তা দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় ‘শিশু মনস্তত্ত্ব ও লীলা মজুমদার’, সেখানে ফ্রয়েড, এরিকসন, আর্নল্ড গেসেল, বনফেনব্রেনারে, গিলফোর্ড, পিঁয়াজে, ভয়টোগস্কি, টরেন্স, রুশো ইত্যাদি মনস্তাত্ত্বিকদের শিশুমন বিষয়ক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে লীলা মজুমদারের ছোটগল্পে যেভাবে শিশুমনস্তত্ত্বের বিষয়গুলি উঠে এসেছে, তার রূপরেখা রয়েছে। ‘বিজ্ঞানভাবনা, শিশুমন ও লীলা মজুমদার’ নামক তৃতীয় অধ্যায়ে লীলা মজুমদার যেভাবে আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, বিজ্ঞানের সম্ভাবনাকে শিশুদের মানসিক ও মানবিক বোধের বিকাশের হিতার্থে ব্যবহার করেছেন, তাই দেখানোর প্রয়াস রয়েছে। চতুর্থ অধ্যায় ‘পশু ও প্রকৃতিপ্রেম, শিশুমন ও লীলা মজুমদার’-এ লীলার শৈশব স্মৃতি, পারিবারিকসূত্রে পাওয়া কিছু সত্য-ঘটনা অবলম্বনে ছোটদের মনে তিনি কীভাবে পশু-পাখিদের প্রতি সহানুভূতি, পশু-প্রকৃতি সম্পর্কিত নানা ভাবনার সঠিক ব্যাখ্যা এবং পশু ও প্রকৃতির

সংরক্ষণ বিষয়ে তাদের সচেতন করেছেন, সেই দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। 'অনন্য ভূতভাবনা, শিশুমন ও লীলা মজুমদার' শীর্ষক পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলার কিছু শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্যিকদের কলমে ভূতেরা যেভাবে ধরা দিয়েছে তার আলোচনার পাশাপাশি লীলা মজুমদারের ছোটগল্পের ভূতেদের আলোচনা করে লীলা মজুমদারের কলমে ভূত যে অন্যান্যদের তুলনায় অনেকখানি আলাদা তাই প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অর্থাৎ শেষ অধ্যায় 'লীলা মজুমদারের শিশুতোষ ছোটগল্পের উপস্থাপনভঙ্গী'তে তাঁর গল্পের কাহিনি বিন্যাস, বিষয় নির্বাচন, চরিত্র গঠন, নামকরণ, ভাষারীতি, শব্দচয়ন, বাক্যগঠন রীতির প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। সমগ্র গবেষণাকর্মে এই ভাবে লীলা মজুমদারের শিশুতোষ ছোটগল্পে ছোটদের চাহিদা, মনোরঞ্জন, শিক্ষা সমস্তকিছুই কীভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করে কালজয়ী সাহিত্যের রূপ নিয়েছে তারই বিশ্লেষণের প্রয়াস রয়েছে।